।। পূজক সম্প্রদায় ।।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানাদি নির্বাহের জন্য ইহাদের নিজস্ব সামাজিক পূজক রহিয়াছে। এই পূজকগণ সাধারণভাবে এই সমস্ত নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, যথা, অধিকারী, দেউসি, ভৌরিয়া, ওঝা, কীর্তিনিয়া প্রভৃতি। এই পূজকদিগের সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা থাকিলে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত পূজা-পার্বণাদি বুঝিতে সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা যাইতেছে।

অধিকারী :—

প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়ীতে উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করা আবশ্যিক কর্তব্য বলিয়া এই সমাজে বিবেচিত হয়। এবং এই তুলসীমঞ্চেই রাজবংশীদের যাবতীয় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দশকর্মবিহিত ও রোগাদি-দূরীকরণার্থ পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষিকেন্দ্রিক বা অন্যান্য পূজাগুলিও এইখানেই সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল পূজার দায়িত্ব ও অধিকার একমাত্র সামাজিক পূজারী অধিকারী সম্প্রদায়ের।

অধিকারী সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি শ্রেণীর নাম চক্রধারী, অন্যটির পাত্রধারী অর্থাৎ পত্রধারী বা কাণ-তুলসী[২] চক্রধারীরা একটি তাম্রনির্মিত চক্র ধারণ করেন জন্য এই নামে ভূষিত হইয়া থাকিতে পারেন। রাজবংশী সমাজে চক্রধারী অধিকারীদিগের পূজা করিবার অধিকার বংশানুক্রমিক এবং তাঁহারা শিষ্যগ্রহণে সক্ষম। অধুনা সামান্য কিছু লোক ব্রাহ্মণদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার দিকে ঝুঁকিলেও সাধারণতঃ সকলেই চক্রধারী অধিকারীদেরই শিষ্য। কাণতুলসী বা পত্রধারী অধিকারীদের পূজার বৃত্তি একপুরুষী। ইঁহারা প্রথমে চক্রধারী অধিকারীর নিকট মন্ত্র ও পূজাদানের যাবতীয় বিধি ব্যবস্থা শিখিবার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরু কাণে তুলসীপত্র গ্রহণের অনুমতি দেন। এই পত্রধারণ ব্যাপারটি হইতেই পত্রধারী বা পাতধারী এবং কাণে তুলসী বহনের অধিকার হইতেই কাণ-তুলসী নামটি আসিতে পারে।[৩] ব্যাপারটি ইহাই নির্দেশিত করিতেছে যে চক্রধারী নাম বিশিষ্ট অধিকারী শাখাটি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং কানতুলসীরা তাহা নহেন। এই অনুমানটির স্বপক্ষে আরও তিনটি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। প্রথম প্রমাণ : চক্রধারীদের মধ্যে ১৬টি পন্থীর[৪] অস্তিত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা নিজেরা মনে করিয়া থাকেন যেমন—নিত্যানন্দ, বলরাম, চৈতন্য, অদ্বৈত, গদাধর প্রভৃতি। সম্ভবতঃ চক্রধারীরা এই সমস্ত বৈষ্ণব সাধক মহাজন বা প্রবর্তকদের শিষ্য-প্রশিষ্য। দ্বিতীয়তঃ, কোচবিহার-জলপাইগুড়ী অঞ্চলে যাহাদের বলা হয় চক্রধারী ও পত্রধারী, অন্য তিনটি জেলাতে তাঁহাদের বলা হইয়া থাকে যথাক্রমে গোঁসাই এবং শুধু অধিকারী। শিষ্য গ্রহণের অধিকার কেবল গোঁসাইদের। এই শব্দটি গোস্বামী শব্দ হইতে জাত হইয়াছে। তৃতীয় প্রমাণ, চক্রধারীদের বংশানুক্রমিক উপাধি অধিকারী, কিন্তু পত্রধারীরা সাধারণভাবে রায়, বর্মণ ইত্যাদি পারিবারিক উপাধিই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জলপাইগুড়ী-কোচবিহার অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের পূজা সম্পন্ন করেন অধিকারী সম্প্রদায়, কিন্তু তরাই এবং তৎ-পশ্চিম পার্শ্বস্থিত অঞ্চলগুলিতে এই পূজা যাঁহারা নির্বাহ করেন তাঁহারা ধামী ও মালী নামে পরিচিত। এই সব অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের থানটিকে ধাম বলা হয়। আর এই থানে একাধিক গ্রামদেবতা পূজা পাইয়া থাকেন জন্য ধাম শব্দটির মধ্যে সঙ্গতি থাকিতে পারে। সুতরাং ধামের পূজারী ধামী এবং দেবতাকে মাল্যদান করা হইতে মালী নামটির উৎপত্তি অসম্ভব না হইতেও পারে।

দেউসি :—

সাধারণতঃ কালীমন্দির, ভাণ্ডানী মন্দির, মহাকাল মন্দির প্রভৃতি এবং চড়ক অনুষ্ঠানের পূজা গুলিতে দেউসি নামে একটি পুরোহিত শ্রেণী পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে শব্দটি সংস্কৃত দেবর্ষি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, যথা দেবর্ষি, দেঅসি, দেউসি। কতক কতক অঞ্চলে চড়কপূজার সংশ্লিষ্ট প্রধান পুরোহিতকে দেব-বংশীও বলা হইয়া থাকে। শব্দটি দেব + অংশী বা দেব-বংশী হইতে আসিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও এই দেবাংশী

শব্দটি সবিশেষ প্রচলিত। কিন্তু, প্রথমতঃ, অধিকতর চালু বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্য অঞ্চল হইতে অতি আধুনিক-কালে আমদানী করা হইতে পারে সেই হেতু দেউসি শব্দটিই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

চড়ক ও ভাণ্ডানীদেবীর পূজায় ব্রাহ্মণের কোন অধিকার নাই, উত্তরবঙ্গের সুপ্রাচীন কালীমন্দির গুলির পূজাতেও ব্রাহ্মণ থাকেননা। যদিও শহরাঞ্চলের উপকণ্ঠস্থিত গ্রামগুলিতে কিছু কিছু কালীপূজা ব্রাহ্মণে সম্পন্ন করিতে ইদানীং দেখা যাইতেছে, তথাপি উহা সংখ্যায় নগন্য। গ্রামের কোন কালীপূজায় ব্রাহ্মণ থাকিলেও সেখানে প্রাথমিকভাবে দেউসি দ্বারা স্বতন্ত্র পূজা দান আবশ্যিক বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহাই হউক, সংশ্লিষ্ট পূজাগুলিতে দেবতাগণের পূজার যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও অনুষ্ঠান পালন, ভক্তের কামনা-বাসনা দেবতাকে অবজ্ঞাত করা এবং অপরপক্ষে দেবতার পক্ষ হইতে মানসকারীকে যথাযোগ্য অভয় ও আশীর্ব্বাদ দান অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্ম এই দেউসিরা করিয়া থাকেন। রাজবংশীদের ধারণায় যোগ্য দেউসির মহাগুণসম্পন্ন মন্ত্র মহিমাতেই দেবতা জাগ্রত থাকেন, কিংবা অযোগ্য কোন দেউসির দুর্ব্বল মন্ত্রাদির কারণে দেবতা ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়েন। এই দেউসি চড়কপূজায় তাঁহার অনুগামী সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেন এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় মন্ত্রবলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভর তুলিয়া দেবমহিমা ও স্বমহিমা প্রচার করেন।

ভৌরিয়া ঃ—

দেউসির মন্ত্রপূত জল নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ছিটাইয়া দিলে যাঁহার ভর উঠে তাঁহাকে বলা হয় ভৌরিয়া বা বিশেষ দেবতার ঘোড়া, যেমন কালীর ঘোড়া, তিস্তাবুড়ীর ঘোড়া ইত্যাদি। ভর উঠিবার কালে সেই ব্যক্তিটির কাঁপুনি আসে এবং তিনি লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বেড়ান। এই সময় তাঁহার হাতে একটি বেতের ছড়ি থাকে এবং উহার দ্বারা তিনি নিজেই নিজের পিঠে সজোরে আঘাত করিতে থাকেন। বেত্রাঘাত করিবার ব্যাপারটি দেহে দেবতা প্রবেশের এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির 'ঘোড়া'-য় রূপান্তরিত হইবার পরিচায়ক। ইহার পর ভৌরিয়াটি পদ্মাসন করিয়া থানে বসিয়া পড়েন, 'সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কাহিনী শুনেন এবং প্রতিকারের যথাবিহিত পন্থা নির্দ্দেশ দিয়া আশীর্বাদদান করেন। পূজা বা অনুষ্ঠান শেষে দেউসির মন্ত্রপূত জল পুনরায় ব্যক্তিটির সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলে তিনি কিছুক্ষণ নিঃসাড় হইয়া থানের উপর মাটিতে শুইয়া পড়েন, কিছুক্ষণ পর সুস্থ হইলে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। ভরগ্রস্ত থাকিবার সময়কার ঘটনাগুলি, অর্থাৎ লম্ফ ঝম্ফ করা, স্বদেহে বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি ভর কাটিয়া গেলে ভৌরিয়ার স্মরণে নাকি থাকে না, কিংবা কোনরূপ যন্ত্রনা বোধও নাকি করেননা।

ভরের অপর একটি প্রতিশব্দ দেহর, যেমন দেহর করা, দেহর দেখা, দেহর দেওয়া। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে[৬] প্রচলিত দেহরী বা দেহরিয়া[৭] শব্দটি এতদপ্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। শব্দটির অর্থ যিনি দেহর করেন অর্থাৎ যাঁহার ভর উঠে।

তিস্তাবুড়ী ঠাকুরাণীর ভৌরিয়ার নাম ত্থান্ধা, ত্থাম্ধা বা ত্থাঁওধা। ইহা "দেবধান" শব্দনিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তরাই অঞ্চলে গ্রামঠাকুরের থানে অম্বুবাচী সংপৃক্ত অনুষ্ঠানে দেবতার ভর উঠে। এই ভৌরিয়াকে বলা হয় "বাড়ামি"। পশ্চিমবঙ্গে "বাড়াম" নামে এক দেবতার পূজা হয় এবং দেবতাটি একটি গ্রামদেবতা বিশেষ।[৮] বড়াম ঠাকুরের থানে যাঁহার ভর উঠে তাঁহাকে বাড়ামি বলা অসম্ভব না হইতেও পারে। আবার পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় গ্রামঠাকুরের থানের নামেই বড়াম থান। বড়াম থানের ভৌরিয়া হিসাবে বড়ামি এবং পরে বাড়ামি নাম আসিয়া থাকিতে পারে।

মেচেনী বা ভেদেই খেলা পর্ব শেষ হইলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে তিস্তাবুড়ী পূজায় সাধারণতঃ ত্থাম্ধা নিয়োগ করা হয়। তবে মানসিক কারণে বৎসরের যে কোন সময়েও ইহা করা যাইতে পারে। দীপান্বিতাকালীন অমাবস্যায় কালীপূজার সময় ছাড়াও কোথাও কোথাও শনি ও মঙ্গলবারে নিয়মিত দেহরের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহরের ব্যাপারটি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে যাইতেছে। কতক কতক অঞ্চলে কালী প্রভৃতি মন্দিরে এখনও ভৌরিয়া প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ী জেলার ধূপগুড়ী থানার অন্তর্গত ১নং শালবাড়ী অঞ্চলের ডুড়ামারী গ্রামে বৎসর কয়েক পূর্বে ঢেকিয়ামতী ঠাকুরের থানে জনৈকা বিধবা স্ত্রীলোকের ভর উঠিত। থানে ১১/১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢেকিয়া অর্থাৎ ফার্ণ গাছ ছিল, এই ঢেকিয়া হইতেই থানটির নাম ঢেকিয়ামতী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে গাছটি মারা যাওয়াতে থানটির

মাহাত্ম্য লুপ্ত হইয়াছে এবং ভর উঠাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে স্ত্রী পূজিকার যে একটি ভূমিকা বর্তমান ছিল বিষয়টি তাহারই দিঙনির্দেশ করিতেছে।[৯]

কীর্তিনীয়া :—

মৃত্যুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনের জন্য যে শ্রেণীটি নিযুক্ত তাঁহাদের "কীর্তিনীয়া" বলা হইয়া থাকে। শবদেহানুগমন হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচশুদ্ধির ১৩ দিন[১০] পর্যন্ত ইঁহাদের কাজ। মৃতের বাড়ী হইতে মৃতদেহ শ্মশান লইয়া যাইবার সময় এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ইঁহারা কীর্তনের সুরে বৃহদায়তন করতাল ও খোল সহকারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জন্য কীর্তিনীয়া শব্দটি আসিতে পারে। মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব যেমন জীবচালান, গৃহশুদ্ধি ইত্যাদি কর্মকীর্তিনীয়াগণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

ওঝা :—

দেশজ বাঙলা ভাষায় যাহা রোজা, উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের ভাষায় তাহা ওঝা বা অঝা হইয়াছে। সাধারণ গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রকরণ, ভূত প্রেত ইত্যাদি অশরীরি আত্মার অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা, সর্পদংশনজনিত "বিষঝাড়া" প্রভৃতি নানাবিধ কর্মের জন্য ওঝাদের প্রবল প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি আছে। বস্তুত যখন উত্তরবঙ্গে ডাক্তার ও আধুনিক ঔষধপত্রের অতিশয় অভাব ছিল তখন ইঁহারাই গ্রামীন লোকের একমাত্র পরম সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শত্রুদমন, ভূতাবিষ্টের আরোগ্য-করণ, শারীরিক বা পারিবারিক নানা বিঘ্নাদি দূরীকরণের জন্য 'পৈরী' অর্থাৎ পরী আনয়ন, হৃত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য নানা আভিচারিক ক্রিয়া সম্পাদন, গ্রামে কলেরা ওলাওঠা প্রভৃতি রোগের মারাত্মক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে অন্য গ্রামে স্থানান্তরকরণ ইত্যাদি জাতীয় নানাবিধ মহদুপকারের সহিত ওঝাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জড়িত। গুণিক বলিয়াও ইঁহাদের অন্য একটি পরিচয় আছে।[১১] উল্লিখিত কর্মগুলিকে গুণ করাও বলা হইয়া থাকে। সুতরাং গুণিক বলিবার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অন্যান্য :—

উপরিবর্ণিত অধিকারী, দেউসি, ভৌরিয়া, ওঝা ও কীর্তিনীয়া ছাড়াও রাজবংশী সমাজে এই জাতীয় আরও কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পালাগান পরিবেশন করিয়া থাকেন তাঁহাদের নাম গীদাল অর্থাৎ গীতকার বা চলিত বাঙ্গালায় গায়েন। দলের মূল গীদালকে অবশ্যই কিছু মন্ত্র-যন্ত্র জানিতে হয়। বিষহরির ভাসান ও সত্যপীর প্রভৃতি পালাবদ্ধ গানের দলের মূল গীদাল বা দলের অন্য কাহাকেও প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিযোগিতার কালে কিছু আভিচারিক কর্মের গোপন রহস্য জানিয়া বা শিখিয়া লইতে হয়। মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে জিতিবার জন্য উত্তরবাঙলার জোতদারগণ একদা তন্ত্র-মন্ত্র শিখিয়া লইতেন। ধানের-কুল-আনা, ব্যাড়াভাসা প্রভৃতি অনুষ্ঠান স্ত্রীলোক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং পূজিকা তাহারা নিজেরাই। মেচেনী খেলা ও হুদুমদেও খেলায় একমাত্র নারীগণ অংশগ্রহণ করে, পুরুষের কোন প্রবেশাধিকার সেখানে থাকে না। ফলে এই দুই কৃত্যের পূজা হইতে যাবতীয় কর্ম দলের মাড়েয়ানী অর্থাৎ প্রধানা বা সম্পাদিকাকে সম্পন্ন করিতে হয়।

রাজবংশী সমাজের বিশিষ্ট ও সম্মানিত পূজক অধিকারী শ্রেণীর উদ্ভবের বিষয়টি ইহাদের ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ভূমিকাতে প্রকল্পধৃত সমাজটির ক্ষত্রিয়ভুক্তির দাবী সমর্থণ করিতে আমরা কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছি। রাজবংশীদিগের দাবী যে তাহারা যখন পরশুরামের ভয়ে সংকুচিত হইয়া উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখনই ব্রাহ্মণ্যধর্মবিহিত পূজাগুলি যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় তজ্জন্য স্ব-সমাজভুক্ত ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পূজাদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকার দান ব্যাপারটি হইতেই 'অধিকারী, নামটি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রাজবংশীদের এবংবিধ দাবীর কোন সুদৃঢ়ভিত্তি নাই বলিয়া মনে হয়। কেননা—

প্রথমতঃ, কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্র গ্রন্থগুলিতে রাজবংশীদিগকে ক্ষত্রিয়ভুক্তির যে পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় তাহাতে অধিকারী নামীয় কোন পূজক শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রাজবংশীরা কেবলমাত্র অধিকারীদের পূজায় অধিকার দানের কথাই বলিয়া থাকে, দেউসি-ওঝা প্রভৃতিদের সম্পর্কে এমন কোন দৃষ্টান্ত দেয় না। অধিকারীর ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানিকভাবে পূজাদানের রীতি প্রবর্তণের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত গুপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিকতার একটি সুর

রহিয়াছে। কেননা রোগাদি দূরীকরণ অন্যান্য ভীতিজনক কারণ হইতেই দেওসি ওঝাদের পূজাদান উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ও স্মরণে রাখিয়াছি যে চক্রধারী অধিকারীরা বৈষ্ণব মহাজনদের শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে পারেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের পন্থীভুক্তির তালিকাটি এই অনুমান করিতে বাধ্য করায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এতদঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং তৎপুত্র বীরভদ্রের প্রচেষ্টায় যে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। [১২] তবুও যদি আমরা ধরিয়া লই যে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রমুখদের আমলেই উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ঐ সময়েই রাজবংশীদের, বিশেষতঃ চক্রধারী গোষ্ঠির মধ্যে এই নবায়িত ধর্মকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে পরশুরামের ভয়ে আত্মরক্ষার্থে উত্তরবঙ্গে আগমন এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির জন্য ধর্মকর্ম আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য অধিকারী নিয়োগ বিষয় দুইটির কোন পরস্পর সঙ্গতি থাকে না। অন্ততঃ ইতিহাস ইহার সমর্থন করিতে চাহিবে না।

চতুর্থতঃ পরশুরাম নির্ভর জনশ্রুতিটির কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না। সুতরাং আত্মগোপন এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিকারী নিয়োগের বিষয়টিকেও ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।

পঞ্চমতঃ জনশ্রুতি অবলম্বনে রাজবংশী জাতির যে সকল ইতিহাস এতাবৎকাল মুদ্রিত হইয়াছে সেইগুলিতে অধিকারী প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিতাদি নাই। [১৩]

দেউসি ওঝা ভৌরিয়া কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি পূজকদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলিতে জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা রহিয়াছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গের প্রায় অধিক অঞ্চল একদা প্রসিদ্ধ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া ভারতের তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কামাখ্যার প্রভাব যে স্বাভাবিকভাবেই এখানকার অধিবাসীদের উপর পড়িতে পারে তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। কাজে কাজেই উক্ত পূজকদের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের অবশেষ পাওয়া অসম্ভব নহে।